জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ১৩, ৩য় বর্ষ, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৩ ইং মঙ্গলবার

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানার্থে বর্তমান ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার সময় আজ উপস্থিত হয়েছে। বিগত এক বৎসরে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো হচ্ছে—পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি গঠন (জুলাই/৯২), জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের ৪টি বৈঠক, দশ মাসের যুদ্ধ-বিরতি, জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা ইত্যাদি। গত বৎসরে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ভারত সফরের (মে/৯২) পর থেকে এসব পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়। কিন্তু পুরো একটি বছর অতিবাহিত হলেও সরকারী কোন পদক্ষেপ অদ্যাবধি সুফল বয়ে আনেনি। বিপরীতভাবে পদক্ষেপসমূহের ভবিষ্যত সাফল্যের সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণতর হয়ে আসছে।

এটা স্বীকার্য যে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ও একটা নির্বাচিত সরকার উত্তরণের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের এক সম্ভবনাময় দিক উন্মোচিত হয়। জনসংহতি সমিতির ঘোষিত একতরফা যুদ্ধবিরতিকালীন সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার প্রথম বৈঠক (৬ই নভেম্বর/৯২) এই সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। অস্তিত্ব বিপন্ন জুম্ম জনগণ ও বিশ্ববাসী সকলে সেই শুভ সম্ভাবনায় আশাবাদী হয়ে উঠে। পরবর্তী সময়েও উভয় পক্ষের যুদ্ধবিরতি ও আলাপ-আলোচনার অব্যাহত ধারা জনমনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করে। কিন্তু পর পর ৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সমস্যার সমাধানের কোন দিক আজো পরিচিহ্নিত হয়নি। এমনকি সর্বশেষ বৈঠকেও সমস্যার মূল দিকগুলো আলোচিত হয়নি। মূলতঃ এসব বৈঠকসমূহে সরকারী পক্ষ সমস্যার মূল বিষয়ে আলোচনা না করে যুদ্ধবিরতি লংঘন ও জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এমনকি বৈঠক চলাকালীন সময়ে সরকারী কমিটির প্রধান স্বয়ং ভারত সফর করে জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও সম্পাদন করেছেন। তা সত্বেও জুম্ম শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলে সরকার সম্প্রতি শরণার্থীদের প্রতি এক বিভ্রান্তিমূলক ক্ষমা ঘোষণাসহ আর্থিক কিছু সুবিধার কথা ঘোষণা করেছে ও চতুর্থ বৈঠকেও এ বিষয়টিকে সরকারী প্রতিনিধিরা প্রাধান্য দিয়েছেন। এতে মনে হয় জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনকে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে মূল সমস্যাকে পাশ কাটানোর সরকারী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সমস্যার সমাধানে সরকারের সদিচ্ছার প্রতি সকল মহলের নিকট সন্দেহ প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

ইতিমধ্যে জনসংহতি সমিতি বার বার অভিযোগ করেছে যে, যুদ্ধবিরতিকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকার ২৪টি নূতন ক্যাম্প স্থাপন করেছে ও শান্তিবাহিনীর সদস্যদের উপর অনেকবার হামলা চালিয়েছে। এসব অভিযোগ সরকারী প্রতিনিধিরা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। যেহেতু চতুর্থ বৈঠকে দুই মাসের যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর শর্ত হিসেবে সরকারী প্রতিনিধিরা ঐ ২৪টি সেনা ক্যাম্প অপসারণের ও যুদ্ধবিরতিকালীন আটককৃত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছেন। সরকারের এই যুদ্ধবিরতি বাড়ানো ও লংঘনের প্রবণতা ইতিমধ্যে জন-মনে কালক্ষেপণের নীতি বলে দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মূলতঃ এ সমস্যার সমাধানে চারটি বৈঠক ও দশ মাসের যুদ্ধবিরতি কম সময় নয়। সরকারের সংযম ও সদিচ্ছা প্রদর্শনের জন্য এটা যথেষ্ট সময়। অথচ সরকার এ দীর্ঘ সময়ে সমস্যার সমাধানের ন্যূনতম সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেনি।

অপরদিকে সরকার মূল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিবেশ সৃষ্টির কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। জুম্ম জনগণের বারবার দাবী সত্বেও জুম্ম বন্দীশালা— গুচ্ছ-বড়-শান্তিগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া হয়নি, অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে দেয়া হয়নি, প্রশাসনকে বেসামরিকীকরণ করা হয়নি, বেদখলকৃত ভূমি ফেরত দেয়া হয়নি, দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ে ও চলাচলে সামরিক বাধানিষেধ তুলে দেয়া হয়নি। তবে বিভিন্ন চেক পোষ্টে দেহ ও মালামাল

তল্লাসী, জিজ্ঞাবাবাদ ও হয়রানি কিছুটা শিথিল করা হয়েছে মাত্র। এছাড়া সরকার পূর্ব গৃহীত বিভিন্ন জুম্ম জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করে চলেছে। ইতিমধ্যে বান্দরবান জেলায় ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে শুরু করা ও খাগড়াছড়ি জেলায় বনায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অথচ জুম্ম ছাত্র জনতা ও জনসংহতি সমিতির দাবীর মুখে সরকার এগুলো স্থগিত রাখতে সম্মত হয়েছিল।

এটা স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার ও পূর্বতন সরকারগুলির মত ও পথ অনুসরণ করে চলেছে। রাজনৈতিক সমাধানের চেয়ে সামরিকভাবে সমাধানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পূর্বতন সরকারগুলির অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান সরকারের শিক্ষণীয় বিষয় যে, সুদীর্ঘ ২৮ বৎসরেও সামরিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা যায়নি, বরঞ্চ সমস্যাটি আরো জটিল হয়েছে। একমাত্র জুম্ম জাতিসত্তার স্বীকৃতি, ভূমি ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। দেশের প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রমনা রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠন, বুদ্ধিজীবি ও ছাত্রসমাজের মতামত ও এটাই। জুম্ম জনগণও এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রত্যাশী। এ রাজনৈতিক সমাধানের পথ এবং সুযোগ এখনো উন্মুক্ত।

সাংবিধানিক গ্যারান্টি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে না

— শ্রীউদয়ন

দেশে-বিদেশে প্রবল জনমতের চাপে পড়ে বর্তমান খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বি এন পি সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ও রাজনৈতিক উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। তদুদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—কি এই রাজনৈতিক সমাধান? তার কাঠামোই বা কি রূপ? জনসংহতি সমিতির দাবীকৃত পাঁচ দফার সাথে কতটুকুই বা সঙ্গতিপূর্ণ হবে? পূর্বতন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারও রাজনৈতিক সমাধানের কথা অনেকবার বলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কোন রাজনৈতিক সমাধান হয়নি। এবারকার রাজনৈতিক সমাধানও কি আগের মতো সেই ভাওতাবাজীতে পর্যবসিত হবে? পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটা অন্যতম স্পর্শকাতর ও বিতর্কিত বিষয় হলো—বাংলাদেশের সংবিধান। এই সংবিধানে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর পাইকারী অভিবাসনের চাপে স্বতন্ত্র জাতীয় ঐতিহ্য ও ভূমিস্বত্ব বিলুপ্তপ্রায় জুম্ম জনগণের জাতীয় ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য কোন সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই। সেই সংবিধান সংশোধনে বা সংবিধানে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক গ্যারান্টি সন্নিবেশকরণে এ সরকার কতটুকু আন্তরিক হবেন?

জুম্ম জনগণের জাতীয় ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয় এমন অধিকার সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমেই কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত ও আদর্শ সমাধান হতে পারে এবং তা স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করবে সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান যখন রচিত ও গৃহীত হচ্ছিল সেই সময় জুম্ম জনগণের জাতীয় ও আবাসভূমির অস্তিত্ব যেন রক্ষিত হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে বিকশিত করার সুযোগ যেন জুম্ম জনগণ পায় সেরূপ অধিকার সম্বলিত স্বশাসনের ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবেশ করার দাবী জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে করা হয়। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী তা মোটেও কর্ণপাত করেননি। ঐ সংবিধানের পশ্চাদপদ ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী জুম্ম জনগণকে অধিকতর অগ্রগামী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর

গড্ডালিকা প্রবাহে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে— এই সংবিধানের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে না বা এই সংবিধানে জুম্ম জনগণের মতো সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আসন্ন করুণ ধ্বংস ঠেকিয়ে জাতীয় ও আবাসভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ও পৃথক স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মতো কোন বিশেষ ধারা বা সংবিধি ব্যবস্থা নেই।

পূর্বতন সরকারের আমলে বার বার অপপ্রচার চালানো হয় যে— ৯, ২৮, ৬৫ প্রভৃতি অনুচ্ছেদের (ধারা) অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব এবং তার আলোকেই তিনটি তথাকথিত স্ব-শাসিত পার্বত্য জেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ ৯নং অনুচ্ছেদ বলে কেবলমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন বা স্থাপন করা যেতে পারে। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর পাইকারী অভিবাসন রোধ করা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখা এবং সর্বোপরি অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা—যার উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যুক্তরাজ্যের স্কটল্যাণ্ড, চীনের স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল, ভারতের ইউনিয়ন টেরিটরি ধাঁচের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন—ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ঐ অনুচ্ছেদের অধীনে কখনোই সম্ভব হতে পারে না। অপরদিকে ২৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কেবলমাত্র নারী বা শিশু বা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ণ করা সম্ভব। কিন্তু সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন কোন বিশেষ এলাকায় স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠীর জন্য আপত্তিকর বিবেচিত হলে ঐ বিশেষ এলাকাকে ঐ আইনের বহির্ভূত রাখা কিংবা ঐ জনগোষ্ঠীর মতামত যাচাই ব্যতীত ঐ বিশেষ এলাকার বিষয়ে যেন কোন সাংবিধানিক সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন না করা হয় ঐরূপ সাংবিধানিক গ্যারান্টিযুক্ত বিশেষ বিধানসহ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় সংবিধি ব্যবস্থা ঐ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণয়ন করা সম্ভব নহে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন বহির্ভূত এলাকার মর্যাদা তুলে দিয়ে উপজাতীয় এলাকায় পরিবর্তন করা এবং তৎপর ঐ মর্যাদাও তুলে দেয়ার বিষয়ে সংবিধানের সংশোধনী গ্রহণ এবং এরশাদের আমলে গণধিকৃত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণের কোন মতামত যাচাই করা হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শোষণ-নিপীড়নের স্বার্থে নিজেদের খেয়ালখুশী অনুযায়ী সংবিধানের এসব সংশোধনী ও আইন প্রণয়ন করে জুম্ম জনগণের উপর বরাবরই জোর করে চাপিয়ে দিয়ে এসেছে।

অনুরূপভাবে ৬৫নং অনুচ্ছেদ বলে কেবল সংসদের মূল আইনের অধীনে নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি প্রবিধান, উপআইন বা আইনগত কার্যকারিতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতাপর্ণ করা যেতে পারে। ঐ বিধান (৬৫ নং অনুচ্ছেদের ১নং উপঅনুচ্ছেদের শর্তাংশ) বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের জন্য সাধারণ উদ্দেশ্য প্রণীত। জুম্ম জনগণের মতো পৃথক সত্বা বিশিষ্ট সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপটের আলোকে প্রণীত নহে। ফলে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও নিজস্ব আবাস ভূমির অধিকারী জুম্ম জনগণের জন্য দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা ও ভারী শিল্প ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এলাকা বা এলাকাবাসীর স্বার্থের অনুকূল সুবিধামতো আইন বা বিধান ঐ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণয়নের অধিকতর ক্ষমতাপর্ণ কখনোই করা যেতে পারে না।

বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠকে জনসংহতি সমিতি কর্তৃক পেশকৃত পাঁচ দফা দাবীনামায় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন এবং গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে যেন কোন সাংবিধানিক সংশোধন ও পরিবর্তন করা না হয় ঐরূপ সাংবিধানিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের দাবী জানানো হয়। জনসংহতি সমিতির পেশকৃত উক্ত দাবীনামা বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী এবং বিভিন্ন বিষয় অবতারণা করে সরকার পক্ষ তা ফেরৎ দেন। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কেবলমাত্র শতকরা ০.৪৫ভাগ জুম্ম জনগণের জন্য দেশের রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলে সরকার পক্ষ দাবী করেন এবং সংবিধানের কাঠামোর আওতাধীন পুনরায় দাবীনামা পেশ করণের অনুরোধ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রকৃতই সমাধান এবং যত দ্রুত সমাধান হবে ততই দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক—এই ঐকান্তিক সদিচ্ছা নিয়ে জন-সংহতি সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত দাবীনামা সংশোধন করে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন সম্বলিত দাবীনামা ৬ষ্ঠ বৈঠকে পেশ করেন। তৎকালীন সরকার ঐ সংশোধিত দাবীনামাও বিবেচনা করতে সম্মত হয়নি।

শেষোক্ত দাবীনামায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠে না। কতিপয় বিধানের পরিবর্তন ও জুম্ম জনগণের মতামত ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে পরিবর্তন না করার সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও আবাসভূমির অস্তিত্ব রক্ষিত হয় এমন কতিপয় বিশেষ আইন সংযোজনের মাধ্যমে বর্তমান রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনেও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা সম্ভব হতে পারে। একটি একক শক্তিশালী ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রেও সংবিধানের ঐ ন্যূনতম সংশোধনী অনিবার্য ও অপরিহার্য্য হয়ে পড়বে। সংবিধানের ঐ প্রয়োজনীয় সংশোধনী করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান কখনোই আশা করা যেতে পারে না। শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের শাসন-শোষণ-নিপীড়নের সুবিধার্থে আগের মতো যেকোন সময় যে কোন পরিবর্তন সাধন করবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বারে বারে অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে—এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে—পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সংবিধানগত সমস্যাও একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। আজ অবধি লক্ষ্য করা গেছে যে, আগের প্রত্যেকটি সরকার সংবিধানে জুম্ম জনগণের জাতীয় ও আবাসভূমির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হয় এমন বিশেষ সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানে বা তদুদ্দেশ্যে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণে বরাবরই অনাগ্রহী ও একরোখাভাবে অনমনীয় ছিলেন। বর্তমান সরকারও কি আগের সরকারগুলোর মতো অনমনীয় ও নেতিবাচক হবেন—এটাই আজ সকল মহলের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন।

অভিমত

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সমাধান প্রসঙ্গে

সলিমউল্লাহ খান

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় এমন তুচ্ছ কিষয়ও নয়। রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে, তদুপরি, দরকার বিশেষজ্ঞের নয়, নাগরিক চেতনার। আগেই বলেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম পূর্বশর্ত ওখানকার যত জাতি আছেন তাদের জাতীয়তা স্বীকার করা এবং গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে বাঙালী জাতির সম্পর্ক পাতা। ১৯৭২ সনে শেষ মুজিবের কাছে মানবেন্দ্র লারমা যে ৪টি মূল দাবী তুলে ধরেছিলেন সেগুলি স্বীকার করে নেয়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। এখনও সে সব দাবিকেই আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে···

বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি 'উপজাতি' সমস্যা আছে; পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, তনচইংগা, ত্রিপুরা, পাহাড়ী ত্রিপুরা, মারমা, খুমি, চাক, খ্রো, বনযোগী, পাংকো, লুসাই এবং দুই রিয়াংতেরটি জাতির দৃষ্টিতে সেখানে যে সমস্যা আছে তার নাম 'বাঙালী' সমস্যা। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

প্রত্যেক জাতির মৌলিক অধিকার হিসেবে বর্তমান দুনিয়ায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। খোদ বাঙালীরা এই অধিকার বলে নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করেছে। বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী, ভারতীয় এবং কর্মী শাসক শ্রেণীর সাথে সুর মিলিয়ে এই সব জাতিকে বলেন উপজাতি। অতএব আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে না।

'উপজাতি' কথাটার উৎপত্তি ইউরোপীয় উপনিবেশ-বাদীদের জবানে। উপনিবেশবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে এবং তার অনুষঙ্গে বর্ণবাদী চিন্তার প্রসারের মুখে এশিয়া এবং আফ্রিকার কোন কোন অংশের জনগণকে উপজাতি (বা ট্রাইব) নাম দেয়া হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের পথে যে সব জাতি সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিল, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদেরকেই উপ-জাতি উপাধি দান করে। তার অনেক পরে খাদ্য সংগ্রাহী ও যাযাবর চাষীদের উপজাতির তালিকায় জায়গা দেয়া হয়। এসব তথ্য অভিজ্ঞ, শিক্ষিত জন মাত্রেই জানেন। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় জাতিগর্বে গর্বিত বাঙালী সমাজের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানরা পর্যন্ত এ তথ্য ভুলে গেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম পূর্বশর্ত এখানেই অপূর্ণ থেকে যায়।

বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী প্রথমদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটকে নিছক ল অ্যাণ্ড অর্ডার সমস্যা ধরে নিয়েছিলেন। শেষের দিকে—কবি এরশাদের জঙ্গী শাসনামলে—সমস্যার প্রকৃতি যে রাজনৈতিক তা প্রথম সরকারীভাবে কবুল করা হয়। কিন্তু এরশাদ সরকার রাজনীতি বলতে বুঝে-ছিলেন জেলা পরিষদ নামে একটা ঠুঁটো জগন্নাথ সভা তৈরী করা। এর আগে জিয়া সরকারও উপজাতীয় কনভেনশন ডেকে আসল সমস্যার মুখ দেখা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা মুখ ব্যাদান করেই আছে। গত ২০ বছর ধরে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন সামরিক কায়দায়। এই লক্ষ্যেই তারা গুচ্ছগ্রাম তৈরী করছেন, বসাচ্ছেন যৌথ খামার। একই লক্ষ্যে তারা নদী সিকস্তি বাঙালী পরিবার ডেকে বসাচ্ছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। এতে আর যাই হোক, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসেনি। যুদ্ধ জারি রয়েছে।

গত এপ্রিল মাসের লোগাং গণহত্যা এবং মে মাসের রাঙ্গামাটি জাতিদাংগা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিরই সাক্ষাৎ ফল। গণহত্যা ও দাঙ্গা যে সেখানে আপতিক ঘটনা নয়, কিংবা নয় ঘটনাচক্র—বরং একটি নির্ণয়যোগ্য পদ্ধতির অনিবার্য ফল তা গত ২০ বছরের ঘটনাবলীর সামান্যতম আলোচনায়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যের কথা—ফিলিস্তিনী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে যাঁরা মাঠ গরম করেন, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা কবিতা ও চিত্রপ্রদর্শনী করেন—তাঁরা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে কথা বলার সাহস পাননি। এমনই মাহাত্ম্য জাতীয়তা-বাদের। ফলে ইউরোপীয় কিছু সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি বিদেশে তুলে ধরছেন। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, বিদেশী সাহায্যদাতাদের চাপ পাওয়ার আগে দেশের শাসকশ্রেণীর টনক নড়বে না।

১৯৮০ সালের মার্চ মাসে কাউখালি গণহত্যার পর খোদ ক্ষমতাসীন বি এন পি দলের সংসদীয় কমিটিতে পর্যন্ত না জানিয়ে দেখামাত্র গুলির ক্ষমতাযুক্ত 'উপদ্রুত এলাকা বিল' পাসের চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তারাই এখনও পার্বত্য চট্টগ্রাম নীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু যে, এখন তাদের প্রতিনিধিরাও বলছেন সংলাপের কথা— রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়ো-জনীয়তার কথা। কিন্তু রাজনৈতিক সমাধান কি বস্তু? লোগাং গণহত্যার তদন্তের জন্যে সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন— ভালো কথা, কিন্তু যে সরকারী নীতির ফলে এই হত্যা ও দাঙ্গা তা কি এ তদন্তের আওতায় পড়বে? পড়বে না, সে তো জানা কথা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় এমন তুচ্ছ বিষয়ও নয়। রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে তদুপরি, দরকার বিশেষজ্ঞদের নয়, নাগরিক চেতনার। আগেই বলেছি পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম পূর্বশর্ত ওখানকার যত জাতি আছেন তাদের জাতীয়তা স্বীকার করা এবং গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে তাদের সাথে বাঙালী জাতির সম্পর্ক পাতা। ১৯৭২ সনে শেখ মুজিবের কাছে মানবেন্দ্র লারমা যে ৪টি মূল দাবি তুলে ধরেছিলেন সেগুলি স্বীকার করে নেয়াই ছিল বুদ্ধি-মানের কাজ। এখনও সে সব দাবিকেই আলোচনার

ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। লারমার প্রধান দাবী ছিল ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের অনুরূপ আইন সংবিধানে গ্রন্থিত করা। ঐ আইনের সারকথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র মর্যাদা। স্বতন্ত্র মর্যাদার বীজ কথা পার্বত্য এলাকার জমির উপর বাঙালী প্রশাসকদের বাইরে থেকে এনে লোক বসানোর যথেচ্ছ অধিকার বন্ধ করা। এ দাবীর মধ্যে অতিস্থীয় কোন ভাবাবেগ নেই, নেই কোন দেশবিরোধিতা। এ দাবী ছিল নূন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারের। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙালী জনগণকে বোঝানো হবে ওরা উপজাতি, ততক্ষণ এ অধিকার স্বীকারের মতো মানসিকতা গড়ে উঠবে না। যুদ্ধের এ মূল কারণ যতদিন না দূর করা হবে যুদ্ধ ততদিনই চলবে।

১৯৪৭ সালে রাঙ্গামাটিতে ভারতের এবং বান্দরবানে বার্মার ঝাণ্ডা ওড়ানো হয়েছিল কয়েকদিন। একইভাবে ১৯৭১-এর মুক্তি যুদ্ধেও পাহাড়ী জনগণ বাঙালী জনগণের মতো স্বতস্ফূর্ত অংশ নেয়নি। রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষে গেছেন, মানবেন্দ্র লারমা যুদ্ধে বলা যাক নিরপেক্ষ ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের আশ্রিত মিজো বিদ্রোহীদের সাথে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক সংঘর্ষ হয়—মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে এ রকম এক যুদ্ধে একজন অফিসার -ক্যাপ্টেন কাদেরসহ অনেক বাঙালী মুক্তিযোদ্ধা মিজোদের হাতে মারা পড়েন। যুদ্ধের পর পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা পাক বাহিনীর দোসরদের সন্ধানে প্রথম বাংলাদেশী সামরিক অভিযান শুরু হলে পাহাড়ী জাতিগুলোর সাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তদুপরি যুদ্ধের সময় থেকেই পাকবাহিনীর ছায়ার যে সব সহযোগী বাঙালী ওখানে বসত পাড়তে শুরু করে, স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার তাদের উচ্ছেদ তো করেইনি, বরং নতুন করে লোক এনে বসায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতিদের চোখে এটাই প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা—বাঙালী সমস্যা। লারমার চার দাবীর এটাও ছিল অন্যতম দাবী।

পাহাড়ী জাতিদের নেতারা দেখিয়েছেন যেখানে ১৯৪৭ সনের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা ছিল শতকরা ২ ভাগের মতো সেখানে বর্তমানে তাদের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে। এরশাদ আমলে যে নতুন জেলা পরিষদ করা হয়েছিল তাতে দেখা যায়, তিন জেলায় মোট বাঙালী সদস্য সংখ্যা ৩০; যা এককভাবে সেখানকার তিন বৃহত্তর জাতির যে কারও সংখ্যা থেকে বেশি (চাকমা সদস্য ২০ জন, মারমা ১৪ জন এবং ত্রিপুরা ৮ জন)। ১৯৭১ সালের পর যত বাঙালী সেখানে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করেছে, বিশেষতঃ সরকারীভাবে যাদের সেখানে বসানো হয়েছে তাদের ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক সমাধানের ২য় শর্তপূরণ হবে না। রাজনৈতিক সমাধানের কথা এখন যারা বলছেন, তারা অন্ততঃ শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ নতুন বসতি স্থাপন স্থগিত ঘোষণা করতে পারতেন। দৃশ্যতঃ মনে হয়, সে সদিচ্ছা বাংলাদেশের শাসকদের নেই।

মানবেন্দ্র লারমার আদি (১৯৭২) স্মারকলিপিতে "উপজাতীয়" রাজাদের দফতর সংরক্ষণের দাবিটি ছিল। কিন্তু সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ এই দাবিটি জনসংহতি সমিতির নতুন দাবিনামা থেকে উঠে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে যে শ্রেণী-সংঘাত বিরাজ করে এই দাবির অন্তর্ভুক্তি ও পরিবর্তনের মধ্যে তার খানিকটা আভাস মেলে। এই সংঘাতের ইংগিত ১৯৪৭ সনেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির এক অংশ "রাজার শাসন পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন। স্নেহকুমার চাকমার নেতৃত্বাধীন সে অংশ তখন পরাস্ত হয়েছিলে। কিন্তু ১৯৭২ সালের জনসংহতি আর ১৯৭৩ সালের গণমুক্তি ফৌজ, শান্তি বাহিনীর নেতৃত্বে বিকাশশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য গড়ে উঠেছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে লারমা ত্রিদিব রায়ের সাথে আঁতাত করেছিলেন: তারপর হয়তো তার আর দরকার পড়েনি। শান্তিবাহিনী যদিও প্রধানত চাকমা জাতির যুব যোদ্ধাদের সংগঠন, এবং খোদ শান্তিবাহিনী যদিও এখন পরিষ্কার দ্বিধাবিভক্ত তথাপি এ কথা লুকানো যাবে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায়সংগত নেতৃত্ব এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং শান্তিবাহিনীর হাতে। রাজনৈতিক সমাধানের কোন চেষ্টাই এই শক্তিকে পাশ কাটিয়ে সফল হতে পারে না। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী মাঠে যে রকম শান্তি বাহিনীকে স্বীকার করেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সেভাবে স্বীকার করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক রক্ত গড়িয়েছে। শান্তি আসেনি। নারমা নিহত হয়েছেন অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্বে। উপেন্দ্র লাল চাকমা বাধ্য হয়েছেন ভারতে পালিয়ে যেতে। সরকারের সাথে সহযোগিতাকারী হিসেবে চিহ্নিত রাঙ্গামাটির জেলা চেয়ারম্যান গৌতম দেওয়ান পর্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির নাজুকতার এর চেয়ে তাৎপর্যময় অন্য কোন ইঙ্গিত কি হতে পারে?

বাংলাদেশের সরকারগুলোর মধ্যে অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে কোন বড় মতভেদ এখনও দেখা দেয়নি। এরশাদ আমলে আন্দোলনকারী বিরোধী দলগুলো আন্দোলনের মুখে একবার দেশব্যাপী প্রস্তাবিত উপজেলা নির্বাচন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৯ সনের জুন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে এরশাদের নির্বাচনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো কিছুই বলেনি। সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান বিরোধী দলের নীরবতা ও পরোক্ষ সমর্থন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন শুভ ইঙ্গিত বহন করেনি। বি এন পি সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর পীড়ন ও দমন নীতি আর এক মাত্রা চড়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। শান্তি বাহিনীর সাথে বহু দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়করা। সরকারী কর্মচারী আর সামরিক কর্মচারীরা সমাধান করতে পারবেন এমন বিষয়ে সীমিত নেই ওখানকার সমস্যা। অনেকে মনে করেন প্রকাশ্য রাজনৈতিক বৈঠকে মিলিত হওয়াটা যেন পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। এখন পরাজয় স্বীকারের সময় হয়েছে বাঙালী শাসক শ্রেণীর। জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভয়ে নয়, বিদেশী একটি শীতল চাপে দূরদেশী সাহায্যদাতাদের চোখ রাঙানিতে এই শাসক শ্রেণী পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথাবার্তা বলছেন। দুঃখটা এখানেই।

সালিমউল্লাহ খান: প্রাবন্ধিক ও গবেষক। বর্তমানে নিউইয়র্কে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত। ['ভোরের কাগজ' ১২ই জুলাই, ১৯৯২ থেকে]

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার পটভূমি ও সমাধানের উদ্যোগ প্রসঙ্গে

ফেরদৌস হোসেন

'মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাই তার প্রথম কর্তব্য হলো অন্যের সাথে ওতপ্রোত হওয়া, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি ওক্তাভিও পাজ বলেছিলেন এ কথাগুলো। পাজের এ দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্র ধরে একথা বলা যায় যে, একের সাথে অন্যের আত্মিক সেতুবন্ধনের যে পিপাসা তা-ই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল পরিবার, গোত্র, উপজাতি এবং জাতি হিসেবে সংগঠিত হতে। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বেও একথার সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু মানব সমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সকলেই 'জাতি' হিসেবে সংগঠিত হতে পারেনি, কোন কোন মানবগোষ্ঠী 'উপজাতি' হিসেবেই রয়ে গেছে।

আমাদের এই বাংলাদেশেও সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী জাতির পাশাপাশি রয়েছে বেশ কিছু উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। সবুজ বনানী শোভিত, পাহাড় শ্রেণীবেষ্টিত বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেই সর্বাধিক সংখ্যক উপজাতীয়ের বাস। এদের মধ্যে রয়েছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং ত্যাংচাঙ্গা, বৌম, রিয়াং, পাংখু, খুমী খ্যাং ম্রো, চাক ও লুসাই।

এই সব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা বিচিত্র খাতে প্রবাহিত এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয়রা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত নয় এবং তারা এতোই অসচেতন, বিক্ষিপ্ত ও নগন্য যে, তাদের পক্ষে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ও তাদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংহতি বিপন্ন হওয়ার কোন বাস্তব সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়রা যদিও ভিন্ন

ভিন্ন সংস্কৃতি ও জীবনধারায় অভ্যস্ত তবুও তাদের মধ্যে গোষ্ঠী নির্বিশেষে তিনটি মৌলিক বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন: (১) তারা সকলেই মঙ্গোলীয় মানব-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, (২) পাহাড় ও অরণ্যে বসবাসে অভ্যস্ত এবং (৩) অভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার (জুম চাষ) ধারক বা উত্তরাধিকার। এছাড়া, দীর্ঘদিন একই অঞ্চলে পাশা-পাশি বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক বা সংহতি গড়ে উঠেছে। অঞ্চলগত বিবেচনায় তারা নগণ্যও নয় এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের উত্থাপিত রাজনৈতিক দাবী ও রাজনৈতিক ভূমিকা বাংলাদেশের অঞ্চলগত অখণ্ডতার বিষয়কে গভীরভাবে প্রবাবিত করে। তাই এই ইস্যুটির রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এর সমাধান অত্যন্ত জরুরী।

লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন সময়ে সরকারী পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে 'প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উস্কানির ফল' কিংবা 'কতিপয় বিপথগামী উপজাতীয় তরুণের সন্ত্রাসী তৎপরতা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শেকড় যে অনেক গভীরে প্রোথিত তা সরকারী মহল অনেক সময়ই যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। সেজন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ব্যাপক ও গভীর সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে রয়েছে। বাস্তবতা হলো, এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস এবং আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের কারণগুলো অনুসন্ধান করা দরকার।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মূল জনজীবন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই সব উপজাতীয় কয়েকশ' বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় প্রায় সার্বভৌম জাতি হিসাবে বসবাস করে আসছিল এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা দুজন উপজাতি প্রধান, যথা চাকমা ও বোমং কর্তৃক শাসিত হতো। উপজাতীয় গ্রাম প্রধানগণ শাসনকার্যে তাদের সহায়তা করতেন।

১৮৬০ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে বিভক্ত করে পৃথক জেলায় পরিণত করে এবং গভর্ণর জেনারেলের একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে এই জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করা হতো।

১৯০০ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক উপজাতীয় অঞ্চলের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য ঘোষিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল। এই ম্যানুয়েল প্রবর্তন করে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দু'টি এলাকা নিয়ে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল সেখানে ৯৫ ভাগ অমুসলিম অধ্যুষিত এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিসদৃশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েল অনুসারে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে এ অঞ্চলকে 'বহির্ভূত এলাকা' হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৬৩ সালে সংবিধানের এক সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা রহিত করা হয়।

পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদার অবসান এবং উপজাতীয় প্রশাসনের অবলুপ্তি ঘটানো হলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে উপ-জাতীয়দের অস্তিত্বের প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবে কখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কেননা পাকিস্তান রাষ্ট্রটি মূলতঃ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বালুচী, পাখতুন এবং বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে উপজাতীয় জনগণ স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করতে পারতো। কিন্তু 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' প্রবল স্রোতে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। কারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র শতকরা ১·৩ ভাগ হচ্ছে উপজাতীয়। এই বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনা থেকেই উপজাতীয়দের একটি অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করে বলে ধারণা করা যায়।

অধিকন্তু, বাঙালী জাতীয়তার প্রবল প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের একটি অংশের বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাঙালীদের মধ্যে উপজাতি বিদ্বেষ দেখা দেয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে বরং সংবিধানে "বাংলাদেশের নাগরিক-গণ বাঙালী বলে পরিচিত হবেন" বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ভিন্নতর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধি-

কারী পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগণ বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক থাকতে চেয়েছে, বাঙালী জাতীয়-তার মূলধারার সাথে কোন অবস্থাতেই মিলে যেতে চায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য চেতনা শুধু যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি হতে উৎসারিত তা-ই নয়; এই স্বাতন্ত্র্য-চেতনার নেপথ্যে আর্থ-সামাজিক কারণও অত্যন্ত প্রবল। বিশেষ করে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ এবং এতদঞ্চলে বহিরাগত বাঙালীদের বসতি স্থাপনকে কেন্দ্র করে উপজাতীয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনে যে সমস্যা দেখা দেয় তার ফলে উপজাতীয় জনজীবনে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৫৭-১৯৬২ সময়পর্বে তৈরী কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বিশেষ করে চাকমা উপজাতীয়দের জন্যে তাৎক্ষণিক বিপর্যয় বয়ে আনে। কেননা, কাপ্তাই বাঁধের কারণে যে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় তার ফলে ১২৫টি মৌজার প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা, যার আওতা-ভুক্ত ছিল ৫৪,০০০ একর আবাদী জমি (যা জেলার মোট আবাদী জমির শতকরা ৪০ ভাগ) প্লাবিত হয়। এর ফল-স্বরূপ ১০,০০০, হালচাষী এবং ৮,০০০ জুমচাষী পরিবারের এক লক্ষের ও অধিকলোক ক্ষতিগ্রস্ত হন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালের ভারত বিভক্তির সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যহীন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২ ভাগ। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতে এ অঞ্চলে বাঙালী বসতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে বাঙালী বসতির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ, ১৯৬১ সালে শতকরা ১২ ভাগ এবং ১৯৮১ সালে শতকরা ৪০ ভাগে উন্নীত হয়। বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, লংগদু, বান্দরবানের লামা, আলীকদম; নাইক্ষ্যাংছড়ি, খাগড়াছড়ির রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা প্রভৃতি উপজেলায় বহিরাগত বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালী জনবসতির এই ব্যাপকতা উপজাতীয়দের জন্যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কেননা, বহিরাগত বাঙালীরা এতদঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর হাল কৃষি, উদ্যান চাষ, শিল্প কারখানার চাকরি, কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য শিকার, দিন মজুরি এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যবসার সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি উপজাতীয় জনসাধারণ সাধারণভাবে এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কর্মহীনতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে আধুনিকায়ন তথা ধনতন্ত্রের প্রসার সাধনের লক্ষ্যে নগরায়ন ও ক্রম-বর্ধিষ্ণু শিল্পজ অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে ষাটের দশক হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ আহরণ শুরু হয়। এক্ষেত্রে প্রধানত বনজ সম্পদের শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং জলবিদ্যুৎ সুবিধা কাজে লাগানোই মুখ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এর সাথে আবার যুক্ত হয়ে পড়ে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক সংখ্যক উদ্বৃত্ত কৃষকদের শহর-মুখী অভিযাত্রা ঠেকানোর লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা।

এই প্রেক্ষাপটে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী প্রচণ্ডভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কেননা, নতুন অর্থনৈতিক ও পুনর্বাসনের সরকারী নীতি তাদের উপজাতীয়-স্বাতন্ত্র্য, জীবনধারণের সুযোগ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অবলুপ্ত করে ফেলবে বলে তাদের মনে হয়েছিল। এই মানসিক প্রেক্ষাপট থেকেই উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে প্রতিরোধ আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করার অভিযোগে কিছুসংখ্যক বাঙালী যুবক সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। অথচ তৎকালীন সরকার এসব ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে উপজাতীয়দের উপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠিত হয় এবং তারা কতিপয় দাবি-দাওয়া নিয়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। জানা যায়, শেখ মুজিব তাদেরকে উপজাতীয়-স্বাতন্ত্র্য পরিহার করে বাঙালী জাতীয়তার সাথে মিশে যাওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যগত অধিকার হারানোর প্রেক্ষাপটে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে

উপজাতীয়রা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে লক্ষ্যেই ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা হিসেবে 'শান্তি বাহিনী' গঠিত হয়।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অত্যন্ত সংঘাতময় ছিল। এই সময়ে শান্তি বাহিনী ও সরকারী বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে এবং সরকারী বাহিনী যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমান সরকার পূর্ণ সামরিক শক্তি দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জিয়া সরকার দমনমূলক তৎপরতার পাশাপাশি এই অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' গঠন এবং জনসংহতি সমিতির বিকল্প হিসেবে 'ট্রাইবেল কনভেনশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু ট্রাইবেল কনভেনশন ইপ্সিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয় এবং 'উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে' পাহাড়ীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

পরবর্তীতে লেঃ জেঃ এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে সক্রিয় করে তোলেন এবং শান্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও জনসংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে শান্তি বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য (প্রধানতঃ প্রীতি গ্রুপ) অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেন এবং জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের ছয় দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শান্তি বাহিনীর সাথে সরকারী বাহিনী ও পুনর্বাসিত বাঙালী জনসাধারণের বিরোধ ও সংঘাত থেমে যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধানের' লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার বিল জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং তার ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুন তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়নি এবং এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বর্তমান নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিলম্বে হলেও সম্প্রতি এ সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধানের' লক্ষ্যে একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছে। উক্ত সংসদীয় কমিটি একটি লিয়াজোঁ কমিটির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে আগামী ১২ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হবে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

জানা গেছে যে, জনসংহতি সমিতির পাঁচ জন শীর্ষনেতা আসন্ন বৈঠকে যোগদান করবেন। দৃশ্যতঃ দুই পক্ষের ১৩/১৪ জন প্রতিনিধির প্রচেষ্টার উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান অনেকাংশে জড়িত। আমরা আশা করবো সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা যথাযথ উপলব্ধি করে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আমলাতান্ত্রিক ও একগুয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে এই জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে বলেই জনগণের প্রত্যাশা। অন্যথায় রক্তভেজা জনপদ আবারো হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে, যা কোন বিবেকবান মানুষের কাম্য নয়।

ফেরদৌস হোসেন : প্রাবন্ধিক, গবেষক। সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[সৌজন্যে ভোরের কাগজ, ঢাকা, ১০/১০/৯২]

সংবাদ

চিয়াং মাই সম্মেলন

মে ১৮-২৩, ১৯৯৩ইং থাইল্যাণ্ডের চিয়াং মাই এ আদিবাসী/উপজাতীয় জনগণের অধিকারের উপর এশিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের ৫৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে এশিয়ায় বসবাসরত আদিবাসী জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষর সম্বলিত ৭টি বিষয়ের উপর এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসব প্রস্তাবের মধ্যে ২নং প্রস্তাবটি ছিল ত্রিপুরা শিবিরে অবস্থানরত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরণার্থীদের উপর।

উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, বর্তমানে ভারতে অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসনের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তার প্রতি এ সম্মেলন গভীর ভাবে লক্ষ্য রাখছে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, এ সম্মেলন উদ্বেগজনকভাবে অবগত রয়েছে যে, পরিস্থিতির কারণে জুম্ম জনগণ মাতৃভূমি থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন এখনো সেই পরিস্থিতির স্থায়ী পরিবর্তন আসেনি এবং জুম্ম শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

তাই সম্মেলনে এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় যে, শরণার্থীদের জোর পূর্বক স্বদেশে পাঠানো যাবেনা, যদি না ;

— পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে নেয়া হয়।

— জুম্ম জনগণকে তাদের জমিজমা ও সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়।

— জাতি সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মসূচীটি তত্ত্বাবধান করা হয়।

— ভবিষ্যতে জুম্ম জনগণের মানবিক অধিকার সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়া হয়।

— এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতিসহ সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান করা হয়।

জুম্ম শরণার্থী'দের প্রত্যাবাসন হয়নি

গত ৮ই জুন জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন শুরু হয়নি। এদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে বারবার যোগাযোগ করেও জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত আনতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সেই সাথে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সরকারের সকল প্রকার ঢাক ঢোল প্রচারণাও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যোগাযোগমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী কমিটির আহ্বায়ক কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ দিল্লী সফর করেন এবং ভারতীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সলমন খুরশীদের সাথে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন বিষয়ক এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে খাগড়াছড়ি ও দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা প্রশাসকদ্বয় এক চুক্তির মাধ্যমে ৮ই জুন শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের তারিখ নির্ধারণ করেন। চুক্তি অনুসারে এদিন সাব্রুম শিবির থেকে ২০০ পরিবার ও ১০ই জুন শিলাছড়ি শিবির থেকে ২০০ পরিবার শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবাসনের কথা ছিল। এ উদ্দেশ্য সরকার শরণার্থীদের অভ্যর্থনা শিবির, খাবার ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৭দিন রামগড়ে শরণার্থীদের অভ্যর্থনা জানাতে সরকারী কর্মকর্তা ও অনেক জুম্ম নরনারী সকাল হতে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সকালবেলায় কোন শরণার্থী প্রত্যাবাসন না করলে সরকারী কর্মকর্তারা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে

যোগাযোগ করেন। এরপর বিকালে সরকারী কর্মকর্তারা সাব্রুমে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ তাদের ১৩ দফা দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, তাদের ১৩ দফা দাবী মেনে না নিলে তাদের পক্ষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। অবশেষে শরণার্থী নেতৃবৃন্দকে স্বদেশে প্রত্যাবাসনে রাজী করাতে ব্যর্থ হয়ে সরকারী কর্মকর্তারা ফিরে আসেন। এইভাবে ৮ই জুন শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন শুরু না হওয়ায় ১০ই জুন ও পরবর্তী সকল প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

পর্যবেক্ষকমহলের মতে শরণার্থীদের দাবীর প্রতি সরকারের উদাসীনতাই প্রত্যাবাসনের ব্যর্থতার মূল কারণ। যেহেতু সরকারে ঘোষিত সুবিধাদি শরণার্থীদের পুনর্বাসনের পক্ষে খুবই অপ্রতুল। আর শরণার্থীদের পেশকৃত ১৩ দফার আংশিক পূরণ হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যাহার, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান ইত্যাদি দাবীসমূহ সরকার মেনে নেয়নি। তাছাড়া ইতিমধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবাসিত শরণার্থীদের অব্যবস্থা ও ১৯৮২ সালে প্রত্যাবাসনের অভিজ্ঞতা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনে নিরুৎসাহিত করছে। তাই ১৩ দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিরাপদ বোধ করছেন না বলে জানা যায়।

মৃতদেহ দাহ নয় কবর দিতে হবে

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার মতে, চাকমারা স্মরণাতীতকাল থেকে একটি শ্মশানে শব দাহ করে মৃত ব্যক্তির সৎকার করে আসছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ করতে সেনা সদস্যরা বাধা প্রদান করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে মহালছড়ি থানার দেওয়ানছড়া গ্রামে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১১ই জুন দেওয়ানছড়া (২৪৮ নং মুবাছড়ি মৌজা) গ্রামবাসীরা জনৈক পোর চান চাকমার মৃতদেহ নির্দিষ্ট শ্মশানে সৎকার করতে গেলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মধ্য আদাম আর্মি ক্যাম্পের (২৩ ইবিআর, মহালছড়ি, জোন) সেনা সদস্যরা মৃতদেহ দাহ করতে বাধা দেয় ও দাহ না করে কবর দিতে নির্দেশ দেয়। গ্রামবাসীরা অনেক অনুনয় বিনয় করেও মৃত ব্যক্তির সৎকারের অনুমতি পায়নি। পরিশেষে গ্রামবাসীরা মৃত ব্যক্তির কবর দিতে অস্বীকার করে ও অন্যত্র দাহক্রিয়া সম্পন্ন করে। উল্লেখ্য যে, জুম্মদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথায় সেনাবাহিনীর এরূপ হস্তক্ষেপ বর্তমানে অহরহ ঘটছে।

জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের ৪র্থ বৈঠক

তৃতীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তানুযায়ী গত ১৪ই জুলাই খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে যথারীতি জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সরকার ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে কর্ণেল (অবঃ) আলি আহম্মদ ও শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা।

এদিন যথারীতি সকাল ১০.৩০ মিনিটে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে ধুনুকছড়া থেকে খাগড়াছড়িতে হেলিকপ্টারযোগে আনা হয়। যোগাযোগ কমিটির সদস্যবৃন্দ সমিতির নেতৃবৃন্দকে সার্কিট হাউজে অভ্যর্থনা জানান। এদিনের সকাল বেলায় বাংলাদেশ সরকারের এটর্ণি জেনারেল ও ডেপুটি এটর্নি জেনারেল, রাশেদ খান মেনন ও কল্প রঞ্জন চাকমা সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে পর পর অনানুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হন। পরে বেলা পৌনে বারোটায় সময় উভয়পক্ষের আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়। দু'দফায় উভয়পক্ষের এ আলোচনা বিকাল ৪.১৫ মিঃ পর্যন্ত চলে। বৈঠকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় —

১। পরবর্তী বৈঠক ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সরকার পক্ষ বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করবেন।

২। দু'টি শর্ত সাপেক্ষে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৩ পর্যন্ত উভয় পক্ষে যুদ্ধবিরতি বলবৎ থাকবে। শর্ত দুটো হচ্ছে—

ক) যুদ্ধবিরতিকালীন যে ২৪টি নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে সেগুলো আগস্ট, ১৯৯২ এর মধ্যে তুলে নেওয়া।

খ) যুদ্ধবিরতিকালীন জনসংহতি সমিতির যে সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে আগস্ট, ১৯৯৩ইং মধ্যে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা।

৩। পরবর্তী বৈঠকে সংশোধিত পাঁচ দফা দাবী-নামার উপর দফাওয়ারী আলোচনা করা হবে এবং সরকার পক্ষ দাবীনামার উপর উত্তর প্রদান করবেন।

বিকেল ৪:১৫ ঘটিকায় বৈঠক সমাপ্তির পর উভয় পক্ষ গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর এক সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিং প্রদান করেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গত সংখ্যায় প্রকাশিত কল্প রঞ্জন চাকমার "পার্বত্য চট্টগ্রাম: সমাধান না কালক্ষেপণের কৌশল" নিবন্ধটি 'ভোরের কাগজ', ৭ই এপ্রিল, ১৯৯৩ থেকে নেওয়া হয়েছিল।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনা: তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।